মেধাসম্পদ রক্ষা করা

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশে এখন আমরা আধুনিক দুনিয়ার কোনো কিছুরই কমতি রাখিনি। আমাদের সেইসব অফিস আছে, যা উন্নত দেশেও আছে। উন্নত দুনিয়ার মানুষ যা করে, আমরাও তাই করি। সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা থাকার পরও দিনে দিনে আমরা বিশ্বের সমানতালেই চলতে শুরু করেছি। বিশ্বজুড়ে আমাদের দূতাবাস আছে, আছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এক কোটি বঙ্গসন্তান। যেভাবেই হোক, আমাদের বস্তুগত সম্পদের পাশাপাশি মেধাসম্পদও আছে। বুঝি আর না বুঝি– এসব বিষয় নিয়ে আমরা কথাও বলি।

সারা দুনিয়া যেসব দিবস পালন করে, আমরাও সেইসব দিবস পালন করি। বিশ্বজুড়ে ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়। আমরাও পালন করি। এই উপলক্ষে আমাদের দেশে কোনো না কোনো মিলনায়তনে সেমিনার হয়। টেলিভিশনে টকশো হয়। স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়। সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্যাটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক বিভাগ এসব আয়োজন করে। প্রতিবছরই এমনটা হয়। আগে এফবিসিসিআই ও ঢাকা চেম্বারের সাথে যৌথভাবে এসব আয়োজন হতো। এখন শিল্প মন্ত্রণালয় নিজেই সেই আয়োজনটি করে। এবারও দিবসটি পালিত হয়েছে।

প্রতিবছরই বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা কোনো না কোনো বিষয়কে প্রতিপাদ্য হিসেবে ঘোষণা করে এবং বিশ্বজুড়েই সেই বিষয়টি নিয়ে দিবসটি পালিত হয়। ২০১৪ সালে প্রতিপাদ্য ছিল চলচ্চিত্র। ২০১৫ সালে প্রতিপাদ্য ছিল সঙ্গীত। আমি কোনো খোঁজ-খবর না রেখেই বলতে পারি– শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ কাজে লাগানোর জন্য ২০১৫ সালেও আনুষ্ঠানিকতার কোনো কমতি হয়নি। কখনও হয় না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ওবা কম কিসে। তারাও ২৩ এপ্রিল বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবসে একাধিক অনুষ্ঠান করে ফেলেছে।

কিন্তু দুটি মন্ত্রণালয় ও মেধাসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সমিতি, সংস্থা, ব্যক্তি কারও এই বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কেউ একটু শব্দ করে উচ্চারণ করে না যে ডিজিটাল দুনিয়াতে মেধাসম্পদ সুরক্ষা করতে না পারলে টিকে থাকা যাবে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ২৭ এপ্রিল সকালেই শিল্প মন্ত্রণালয় মেধাসম্পদ শব্দটির কথাই ভুলে যায়। বছরজুড়েই থাকে এই নীরবতা। অন্যদিকে ২৩ এপ্রিল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিস গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস পালন করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বা কপিরাইট অফিস কোনো আলোচনা সভার আয়োজন করে। তবে দিনটি উদযাপনের পর এরাও বছরজুড়ে সুখনিদ্রায় সময় কাটায়। এমনকি নিজেদের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখে না এরা।

বাংলাদেশে মেধাসম্পদ বা সৃজনশীলতার কোনো মর্যাদা নেই। বাস্তবে সৃজনশীল কাজকে এখানে তেমনভাবে সুরক্ষা দেয়া হয় না এবং সৃজনশীল কাজ সৃষ্টিতেও তেমন প্রণোদনা নেই। বরং বিষয়টি বিপরীত দিকেই ধাবিত হচ্ছে। এ দেশে মেধাসম্পদের যেসব খাত আছে, এর সবগুলোতেই নাজুক পরিস্থিতি বিরাজ করে। বস্তুত দেশটিকে মেধাসম্পদ চুরি বা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের স্বর্গরাজ্য বললে ভুল বলা হবে না। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করলে দেখা যাবে,

এখানে বই ফটোকপি হওয়া থেকে নকল বই প্রকাশ করাটাও খুব সহজ এবং স্বাভাবিক কাজ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগায় নকল বই বিক্রি হয়, কিন্তু ব্যবস্থা নেয়ার কেউ নেই। গান বা চলচ্চিত্রের একটি কপি কোনোভাবে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর সেটির নকল রাস্তাঘাট থেকে বাণিজ্য বিতান পর্যন্ত অবাধে বিক্রি হয়। ইন্টারনেট, পেনড্রাইভ, সিডি-ডিভিডি তো আছেই। মোবাইলের রিংটোন হিসেবে মাল্টিন্যাশনাল বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মেধাসম্পদ লঙ্ঘন করলেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এ দেশে সফটওয়্যারের কোনো মেধাস্বত্ব কাজই করে না। বরং অরিজিনাল সফটওয়্যার ব্যবহার করাকে বোকামি মনে করা হয়। সরকারি অফিস, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যাপকভাবে পাইরেসি হয়। একটি সরকারি অফিসের অবস্থার বিবরণ দিতে পারি। সেই অফিসটি সুতন্বীএমজে ফন্টে কাজ করে। গত বছর তারা ১৫০টি ল্যাপটপ কিনেছে। অরিজিনাল উইন্ডোজ ও অরিজিনাল অ্যান্টিভাইরাস কিনেছে। কিন্তু প্রতিটি কমপিউটারের বাংলা সফটওয়্যার পাইরেটেড কপি।

দেশে সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ না হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে মেধাস্বত্বের সংরক্ষণ করার বিষয়ে সচেতনতা না থাকা। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে টের পাই সফটওয়্যার পাইরেসি কী ভয়ঙ্করভাবে নতুন উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়কে আঘাত করতে পারে। এখানে এমনকি মেধাস্বত্ব অধিকার করাটাই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। বারবার দেখেছি, এখানে চোরের মায়েরই বড় গলা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, এই দেশে মেধাসম্পদ তৈরি করাটাই অপরাধ।

বাণিজ্য বা শিল্পবিষয়ক মেধাসম্পদের অবস্থাও এখানে নাজুক। এ দেশে প্যাটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক বিষয়ে খুব স্বল্প সচেতনতা বিরাজ করে। নকল পণ্য দিয়ে গড়ে ওঠে দেশের বাজার। বিদেশী বা দেশী পণ্যের প্যাটেন্ট, ডিজাইন বা ট্রেডমার্ক চুরি করা খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

কৃষিভিত্তিক একটি দেশে মেধাসম্পদ নিয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠার বিষয়টি বিলম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ মেধাসম্পদের ধারণাটি কৃষি যুগের পরে শিল্প যুগের প্রসারের পর থেকেই বিকশিত হতে থাকে। কৃষি যুগে মানুষ তার সৃজনশীলতার সাথে আবহাওয়া ও প্রকৃতিকেই ▸

অনেক বেশি যুক্ত রেখেছে। নিজের সৃষ্টির সুযোগটা তার তখন প্রায় ছিলই না। আদি যুগে মানুষের পাথরের বা ধাতুর তৈরি হাতিয়ারগুলো মূলত আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণেই কাজে লাগত। কৃষি যুগে সেই হাতিয়ারগুলো বদলালেও আধুনিক মানুষের সৃজনশীলতার সাথে তার শিল্প যুগোত্তর ভাবনা, জীবনধারা ও হাতিয়ারগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। আমরা শিল্প যুগটাকে মিস করেছি বলে মেধাসম্পদের সেই গুরুত্বটা আমাদের সমাজে বিকশিত হয়নি। তবে ইংরেজ শাসনামলে আমরা ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের যেসব প্রভাবে প্রভাবিত হই, তার মাঝে শিক্ষাকে সবার ওপরে রাখতে হবে। শিক্ষার মতোই আরও অনেক বিষয় যেমন মেধাসম্পদ বিদেশীরা তাদের স্বার্থেই রক্ষা করার জন্য আইনী কাঠামো গড়ে তুলে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এখন পর্যন্ত আমরা ইংরেজ আমলের সেইসব আইনী কাঠামোগুলোকে হালনাগাদ করতে পারিনি। আমরা কপিরাইট আইন ও ট্রেডমার্ক আইন নতুনভাবে তৈরি করতে পারলেও প্যাটেন্ট-ডিজাইন আইন এখনও নবায়ন করতে পারিনি। যদিও আমরা জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন আইন তৈরি করতে পেরেছি, তবুও কপিরাইট আইনে লোকশিল্প বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। এমনকি এখনও আমাদের সফটওয়্যার শিল্পকর্ম হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এই আইনটি সংশোধন করার জন্য গঠিত কমিটির একটিও সভা হয়নি।

মনে হয়, মেধাসম্পদ কার কোথায় কীভাবে বিরাজ করে সেটি নিয়েও আমরা সচেতন নই। যেমন চলচ্চিত্রের কথাই ধরা যাক। এতে চিত্রনাট্য থাকে, থাকে সিনেমাটোগ্রাফি, থাকে শিল্পনির্দেশনা, থাকে পোশাকের ডিজাইন, অভিনয় ও প্রযোজনা। আমরা কি জানি এতসব বিষয়ের মাঝে কোন কাজের মেধাস্বত্ব কার? এমন জটিল আরও বিষয় রয়েছে। আমরা এখনও বিতর্ক করি মিউজিকের মেধাস্বত্বের কোন অংশটি কার বা কে কতটা অংশ পায়। ওখানেও সুরকার, গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী, গীতিকার ও প্রযোজকের প্রশ্ন রয়েছে। এখনও আমাদের বিতর্ক হয়– কোনো কোম্পানিতে কেউ সফটওয়্যারের কোড লিখেলে সেই কোডের মালিকানা কার হয়? এমনকি কারও কপিরাইটকৃত-প্যান্টেটেড মেধাসম্পদ অবলীলায় অন্য কেউ ব্যবহার করেই বসে থাকে না, তার মেধাস্বত্ব দাবিটাকেও অস্বীকার করে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে।

অন্যদিকে কোনো মেধাসম্পদ যখন বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়, তখন তাতে কীভাবে মেধাস্বত্ব রক্ষা করা যায়, সেইসব বিষয় নিয়েও আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। আইনেও বিষয়গুলো স্পষ্ট নয়।

আরও একটি বড় দুর্বলতার বিষয় হচ্ছে পাইরেসির সংজ্ঞা। কপিরাইট আইনে বলা আছে, কোনো পণ্যের হুবহু বা অংশবিশেষ নকল করলে পাইরেসি। কিন্তু সেই অংশবিশেষের পরিমাণটা কী সেটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

অন্যদিকে মেধাসম্পদের নিবন্ধন, ব্যবস্থাপনা, মেধাসম্পদ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা পীড়াদায়ক। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবকাঠামোগত সক্ষমতা গড়ে তোলার বিষয়টি বস্তুত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য হয় না। জনবল থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা আমাদেরকে হতাশ করতেই পারে। সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ হতে পারে মেধাসম্পদ নিয়ে আমাদের সচেতনতার অভাব। সাধারণ জনগণ তো বটেই, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সৃজনশীল কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠী এবং মেধাসম্পদ ব্যবহারকারীরা বস্তুত অদৃশ্য এই সম্পদকে সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করেন না।

জানি না, কোটি কোটি টাকায় তৈরি করা একটি চলচ্চিত্র যদি কেউ একজন সিনেমা হল থেকে কপি করে সিডি-ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেটে ফ্রি বিতরণ করে তবে প্রযোজকের কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ ওঠে আসবে কোন পথে। একটি কষ্টের গান মোবাইল অপারেটরেরা যদি রিংটোন হিসেবে তার অনুমতি ছাড়া বিতরণ করে, সেটি যে চুরি তা আমরা বুঝি না। একটি সফটওয়্যার কপি করে ব্যবহার করা যে অপরাধ, সেটি আমরা মানতে চাই না। এমনকি কারও সম্পদ আমি আমার নামে চালিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না।

প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইনটি ১০০ বছরেরও প্রাচীন বলে সেটি কোনোভাবেই সময়ের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে একসময়ে পাইরেসি যত কঠিন ছিল এখন আর তেমনটি নেই। ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ফলে মেধাসম্পদ লঙ্ঘনের মতো ডিজিটাল অপরাধ করাটাও অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। যেকেউ যখন-তখন যেকোনো ডিজিটাল মেধাসম্পদ বিনা বাধায় পাইরেসি করতে পারছে। কিন্তু এ ধরনের অপরাধ মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও হয়নি। আমি মনে করি, আমাদের আর দেরি করার সময় নেই। পাইরেসির জন্য আমাদের পুস্তক প্রকাশনা, সফটওয়্যার উন্নয়ন, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রসহ সব সৃজনশীল খাত চরমভাবে বিপন্ন। এজন্য আমাদেরকে মেধাসম্পদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্প বা বাণিজ্যবিষয়ক মেধাসম্পদের সুরক্ষা ছাড়া আমরা যে ডিজিটাল যুগে টিকতে পারব না সেটিও আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমরা যে ট্রিপস চুক্তি বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য, সেই কথাটিও আমাদেরকে ভাবতে হবে। সবচেয়ে বড় কথাটি হলো, শুধু বছরে একদিন একটি মেধাসম্পদ দিবস পালন করে আমরা বিদ্যমান অবস্থা বদলাতে পারব না। আমাদেরকে বছরের ৩৬৫ দিনই মেধাসম্পদ সুরক্ষার লড়াই করতে হবে। শুধু সরকারের দিকে তাকিয়েও আমরা আমাদের মেধার লালন করতে পারব না, নিজেদেরকেই নিজেদের কাজ করতে হবে। আমাদেরকেই ভাঙতে হবে সৃজনশীলতার রুদ্ধদ্বার।

আমি মনে করি, এই মুহূর্তেই মেধাসম্পদ সুরক্ষার জন্য কিছু কার্যকর উদ্যোগ নেয়া দরকার। খুব সংক্ষেপে সেই প্রস্তাবনাগুলো তুলে ধরতে পারি।

ক. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে কপিরাইট অফিস ও ডিপিডিটিকে একীভূত করে একটি আইপি অফিস স্থাপন করে মেধাসম্পদ বিষয়ে ওয়ানস্টপ সেবা দেয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক এবং সেই অফিসটিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত ও জনবল নিয়োগসহ অবকাঠামোগতভাবে শক্তিশালী করা হোক। অফিসটিকে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর করা হোক। বেসরকারি খাতকে এর অবকাঠামো গড়ে তোলায় অংশ নিতে দেয়া হোক। বস্তুত অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা উচিত।

খ. প্যাটেন্ট ও ডিজাইন, কপিরাইট আইনসহ সব আইনকে হালনাগাদ করা হোক। কপিরাইট আইন সংশোধন করার জন্য গঠিত উপকমিটিকে সক্রিয় করা হোক। কপিরাইট বোর্ডকে সক্রিয় করা হোক। প্যাটেন্ট আইন সংসদে পেশ করা হোক। অন্য আইনগুলোকে সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া হোক।

গ. জনগণকে পাইরেসি সম্পর্কে সতর্ক করা হোক এবং অ্যান্টিপাইরেসি টাস্কফোর্স গঠন করে সক্রিয়ভাবে পাইরেসিবিরোধী অভিযান চালানো হোক। বেসিস, বিসিএস, সঙ্গীত শিল্প সমিতি, সিনেমা শিল্প সমিতি, চেম্বার, এফবিসিসিআইসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরকে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে এগিয় আসার অনুরোধ করছি।

আমরা প্রত্যাশা করব, সরকারি-বেসরকারি মহল এটি উপলব্ধি করবে যে আগামী দিনে মেধাসম্পদই হবে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আমি স্মরণ করিয়ে দিই, মার্কিন জিডিপির শতকরা ৩৫ ভাগ আসে শুধু মেধাসম্পদ থেকে। আমরা কোনো শতাংশই যোগ করতে পারি না কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com